মার্ক টোয়েনের দেশে

শেখর বসু

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ ১ ॥

হ্যানিবল শহরটা ভারী সুন্দর দেখতে। হঠাৎ মনে হবে কোনও পাহাড়ি শহরে এসে পড়েছি। পাশে ছোটোখাটো পাহাড় আছে। জমি অসমতল। এখানে উঁচু, ওখানে নিচু। বাড়িঘরগুলো ছবির মতো। পাশেই দুকূলপ্লাবী অন্তহীন এক নদী। বড়ো-বড়ো নৌকো ভাসছে নদীতে। ওপারে ঘন সবুজ গাছপালার সরু একটা রেখা। সবার আগে নদীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করবে। কারণ নদীর নাম মিসিসিপি। পৃথিবীর বহু মানুষ জানেন, সুদীর্ঘ এই নদীর সঙ্গে নানা রহস্যরোমাঞ্চের কাহিনি জড়িয়ে আছে।

কিন্তু নদীর দিকে পা বাড়াবার মুখে থমকে যেতে হয়েছিল রামবিচ্ছু ওই ছেলেদুটোর মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই। ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি। মূর্তির গায়ে হালকা লাল-কালচে ছোপ। কিন্তু চিনতে একটুও অসুবিধে হয় না। মনে হয়, ঠিক যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। চোখেমুখে দুষ্টুমির ছাপ। পা সামান্য বাড়ানো। এক্ষুনি বুঝি আর একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়বে! দুর্ধর্ষ এই জুটির নাম টম স্যয়ার আর হাকলবেরি ফিন। এদের যিনি সৃষ্টি করেছেন বিখ্যাত সেই লেখক মার্ক টোয়েনের ছেলেবেলা কেটেছে এই হ্যানিবলেই।

হ্যানিবলে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের প্রায় সবারই আকর্ষণের কেন্দ্রে আছেন এই লেখক এবং অতি অবশ্যই তাঁর গল্পের চরিত্ররা। কল্পচরিত্রদের এতখানি জীবন্ত হওয়ার ঘটনা সাহিত্যে খুব একটা ঘটেনি। অনেকের কাছে মার্ক টোয়েন ততখানি সত্যি, যতখানি সত্যি তাঁর বানানো চরিত্ররা। টম, হাক, বেকিকে মিথ্যে ভাবা অসম্ভব। পলিমাসি, মিসেস থ্যাচার—এমনকি ইনজুন জোও যেন রক্তমাংসের মানুষ।

একজনমাত্র লেখক এবং তাঁর সৃষ্ট কিছু কল্পচরিত্র গোটা হ্যানিবল শহরটিকে মায়াময় করে তুলেছে। আমেরিকার মিসৌরি রাজ্যের বন্দর-শহর হ্যানিবলের বেশ নাম আছে ব্যবসাবাণিজ্যের জগতে। কিন্তু সবকিছুকেই ক্রমাগত ছাপিয়ে ওঠে টম-হাক-বেকিদের কাণ্ডকারখানা। মার্ক টোয়েনের আমলের, অর্থাৎ দেড়শো-দুশো বছরের আগেকার পোশাকআশাক এখনও অনেকে গায়ে চাপায়। সেদিনের সাজে ঘোড়ায়-টানা গাড়ি ছোটে

শহরের রাস্তায়। অনেকটা সেদিনের মতো নৌকো চেপে নদী-ভ্রমণে যায় মানুষজন। সেদিনের মতো গুহা-সফর এবং পাহাড়ে চড়াও আছে।

পর্যটকরা ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য টাইম-মেশিনে চেপে মার্ক টোয়েনের সাবেক হ্যানিবল থেকে ঘুরে আসতে পারেন। এ শহরটা বুঝি অতীতের পাতায় হারিয়ে যাওয়ার জন্যে।

হ্যানিবলের আজকের বাসিন্দারা পরম মমতায় শহরের নানা জায়গায় সেদিনের একটি গ্রামকে ধরে রেখেছেন। এর মূলে আছে এখানকার এক লেখকের প্রতি পাঠকদের প্রগাঢ় ভালোবাসা।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়েছেন : আধুনিক মার্কিন সাহিত্যের পুরোটাই উঠে এসেছে মার্ক টোয়েনের একটিমাত্র বই থেকে। বইটির নাম 'দি অ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরি ফিন।' উইলিয়াম ফকনার বলেছেন—মার্কিন সাহিত্যের পিতার নাম মার্ক টোয়েন।

মার্কিন মহাদেশের নানা জায়গায় ঘুরেছি আমি, আর থেকে থেকেই মনে হয়েছে — আমি মার্ক টোয়েনের দেশেই ঘুরছি। এমন মনে হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ সবসময় হয়তো খুঁজে বার করা যাবে না। কিন্তু পাশাপাশি একটা গূঢ় কারণও তো থাকে। হয়তো সেখানেই আমার অমন মনে হওয়াটা চেপে বসেছে।

হ্যানিবলে টম আর হাকের মূর্তি আমাকে থামিয়ে রেখেছিল কিছুক্ষণ। তারপর আমি ওদের আকর্ষণ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম মিসিসিপির দিকে। আর এগোতেই বিখ্যাত ওই নদীর মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম।

টমদের অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনিতে জেনেছিলাম, মিসিসিপির ওপারটা দারুণ নির্জন। ওখানে বেশ কিছু ভাঙাচোরা বাড়ি আছে, কিন্তু লোকজন বিশেষ নেই। আছে কয়েকটা হানাবাড়িও।

বেপরোয়া টম আর হাক একটা হানাবাড়িতে হানা দিয়েছিল একবার। বাড়িটা নাকি ভূতপেত্নিদের খুব পছন্দ। কিন্তু ভূত নয়, বোধহয় ভূতের চেয়েও ভয়ানক ইনজুন জোকে ওখানে দেখে আঁতকে উঠেছিল ওরা।

ইনজুন খুনে, চোখের পলক পড়ার আগে লোক খুন করতে ওস্তাদ। অতি কষ্টে লোকটার চোখের আড়ালে গিয়েছিল দুই বন্ধু। অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু সেই বৃত্তান্ত পড়ার সময় আজও বোধহয় পাঠকদের মেরুদণ্ডে শিরশিরানি খেলে যায়!

নদীর ওপারের গাঢ় সবুজ রেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, সেদিনের মতো কিছু হানাবাড়ি আজও হয়তো অবশিষ্ট আছে। যদি সত্যিই থাকে, সেদিনের মতো গুপ্তধন থাকতেই বা বাধা কোথায়!

টমদের অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনি শুধু হানাবাড়ি নয়, পাহাড় জঙ্গল এবং গোলকধাঁধার মতো ভয়ংকর গুহাতেও ছড়িয়ে আছে। ওই গুহাতে ঢোকা সহজ, পথ হারানো বুঝি আরও সহজ। আর, একবার পথ হারালে বেঁচে ফেরা কঠিন —।

একটু দূরে ভয়ংকর সেই গুহামুখ। গুহার মুখে স্টিলের গেট। ওপরে লেখা আছে, 'মার্ক টোয়েন কেভ', নীচে লেখা ১৮৯০ এনট্রান্স। এ গেট দিয়ে যে-কেউ গুহার মধ্যে ঢুকতে পারবে না। টিকিট কাটতে হবে আগে। কিন্তু টিকিট কাটলেই ঢোকার ছাড়পত্র মেলে না। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত গাইডের সঙ্গে যেতে হবে।

গুহায় ঢোকার আগে পর্যটকদের একটি হলঘরে ঢুকিয়ে গুহার কিছু ভিডিও-ক্লিপিং দেখিয়ে গুহার পরিচয় ও নিরাপত্তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর জনাকুড়ি পর্যটকের এক-একটা ঝাঁক পালা করে নিয়ে যাওয়া হয় ভেতরে। যাওয়ার আগে মাথাগুনতি হয়, ফেরার পরেও তাই। গুহার মধ্যে বেশ ঠান্ডা, সুতরাং উপযুক্ত পোশাকও পরে নিতে বলা হয়।

টম স্যয়ারের অনবদ্য অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনির সুবাদে সারা দুনিয়ায় ভয়ংকর-সুন্দর এই গুহার মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে। এই গুহা-ভ্রমণ না করলে হ্যানিবল-সফরই নাকি অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

গুহা-ভ্রমণে সেদিনের শেষ ঝাঁক ছিলাম আমরাই। সাদা, কালো, হলুদ, ব্রাউন রঙের মানুষজনদের দেখলেই বোঝা যায় এঁরা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন। নানা ভাষাভাষী মানুষ। ইংরেজি ছাড়া বাকি সব ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু চোখমুখের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিলাম গুহার টানে প্রত্যেকেই কমবেশি উত্তেজিত। অ্যাডভেঞ্চারস অব টম স্যয়ারের গা-ছমছমে সেই অধ্যায়টির কথা আমার মতো আরও অনেকেরই মনে পড়ে গিয়েছিল নির্ঘাত।

সেই যে টম আর তার প্রিয় সঙ্গিনী বেকির গুহার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনি—তা কী ভোলা যায়!

এ গুহায় ঢোকার মুখ এদিকে একটাই। কিন্তু একটুখানি যাওয়ার পরেই একমুখ শতমুখ হয়ে গেছে। আশ্চর্য গোলকধাঁধা। একবার পথ হারালে বেঁচে ফেরা কঠিন।

টম স্যয়ারের গল্পে একঝাঁক ছেলেমেয়ে সেদিন পুরনো একটা স্টিম ফেরিবোটে ম্যাকডগলাস গুহার উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছিল। পিকনিক-পার্টি, বেড়ানো, গুহা-ভ্রমণ সব হবে ...।

ফেরিবোটে চেপেই দস্যি ছেলে টমের মাথায় একটা মতলব খেলে গিয়েছিল। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে, সেই রাতে ওদের এক আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে থাকার কথা। কিন্তু টম বেকিকে বলল—না, ওখানে নয়, অন্য জায়গায় থাকব। আরও মজা হবে। ভালোমানুষ বেকি প্রথমে গররাজি হয়েছিল, কিন্তু টমের চাপাচাপিতে মত দিয়েছিল পরে।

কিন্তু সেই মতলবটা কাজে লাগাবার সুযোগ পায়নি ওরা। পুরো ব্যাপারটা হঠাৎই ঘুরে গিয়েছিল অন্যদিকে। ফেরিঘাটে নেমে অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের ঝাঁকটা একদফা নাচানাচি করল। তারপর পেটপুরে নানারকম মুখরোচক খাওয়াদাওয়া করল। তারপর?

তারপর তো ভ্রমণের সেরা অংশ। রহস্যরোমাঞ্চে মোড়া ওই গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। গুহার মধ্যে দিনের বেলাতেও বিচ্ছিরি অন্ধকার। ছেলেমেয়েরা তৈরি হয়েই এসেছিল। ওদের হাতে অনেকগুলো মোমবাতি। মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার গুহার মধ্যে

ঢুকে পড়েছিল সবাই। সরু, স্যাঁতসেঁতে গুহা। গোলকধাঁধার মতো একটা পথ অনেকগুলো হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে চারদিকে। সাবধান! খুব বেশি দূরে যাওয়া ঠিক হবে না। সাবধানবাণী টম আর বেকিরও মনে ছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। মজাদার গল্পের তোড়ে ওরা এগিয়েই চলেছিল সামনের দিকে।

একসময় হুঁশ হতেই ফেরার পথ ধরেছিল। কিন্তু ফেরার পথটা কেমন যেন অচেনা-অচেনা। গলা ফাটিয়ে বন্ধুদের নাম ধরে ডেকেছিল ওরা। কিন্তু প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনও শব্দই ভেসে আসেনি।

পথ যে হারিয়েছে— আর কোনও ভুল নেই সে ব্যাপারে। শুরু হল ফেরার পথ খোঁজা। কিন্তু ওই অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনির পাঠকমাত্রই জানেন—তিনদিন তিনরাত ধরে ওদের পথ খুঁজে বার করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

টমের পকেটে একটুকরো কেক ছিল, সেই কেক একটু-একটু করে খেয়েছে ওরা। গুহার মধ্যে কোথাও-কোথাও ঝরনার সরু ধারা আছে, সেই জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়েছে। কিন্তু খাবার তো আর নেই। ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিল ছেলেমেয়ে দুটি।

এর মধ্যে আর এক ভয়ংকর বিপদ। গুহামুখের পথ খুঁজতে খুঁজতে ওরা একদিন দেখে গুহার আর একপ্রান্তে মোমবাতির আলো। একটু বাদেই মোমবাতি হাতে-ধরা লোকটাকে দেখা গিয়েছিল। সর্বনাশ! এ তো সাংঘাতিক সেই খুনে ইনজুন জো! ওর সঙ্গে বোবা-কালা-সাজা সেই স্প্যানিয়ার্ড। ওদের দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে। প্রাণের ভয়ে উলটো পথে ছুট লাগিয়েছিল টম আর বেকি।

ওদিকে, ওদের গ্রামে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। ফুটফুটে দুটো ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেল এভাবে! ওদের উদ্ধারের জন্যে গ্রামের বহু মানুষ ঢুকে পড়েছিল গুহায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি চালানো হয়েছিল। কিন্তু না, ওদের কোনও চিহ্নও পাওয়া যায়নি।

গোলকধাঁধার মতো গুহায় ওদের যে কী পরিণতি হয়েছে—তা নিয়ে কারও কোনও সংশয় ছিল না। তিনদিন তিনরাত কেটে গিয়েছে। কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছেন টমের পলিমাসি আর বেকির মা মিসেস থ্যাচার।

ছেলেমেয়ে দুটি ফেরার পথ খুঁজতে গিয়ে একবার কয়েক হাজার বাদুড়ের খপ্পরে পড়েছিল। সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা! কোনোমতে ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল ওরা।

শেষের দিকে টমের মাথায় বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল একটা। ওর পকেটে বেশ কিছুটা ঘুড়ির সুতো ছিল। সে সুতো পাথরের কোনায় বেঁধে বেকির হাত ধরে বলেছিল : চলো, আমরা আর একবার চেষ্টা করে দেখি বেরুবার পথ পাওয়া যায় কি না। না পেলে এখানেই ফিরে আসব আবার। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ। দ্বিতীয় দফায় বেকির আর নড়ার ক্ষমতা ছিল না। টম বলল : ঠিক আছে, তুমি বোসো, আমি যাচ্ছি। একটু বাদে ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে টম বলল : বেকি শিগগির এসো, আমি বেরুবার পথ খুঁজে পেয়েছি—। চার-চারটে দিন পরে গ্রামে ফিরে এসেছিল ওরা। এ যেন এক অলৌকিক উপায়ে বেঁচে ফেরা! মাঝরাতে গ্রামের গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠেছিল ঢং-ঢং করে। কী

ব্যাপার? সবাই ছুটে এসে শুনল—টম আর বেকি ফিরে এসেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল প্রত্যেকেই। ওদের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনির পাঠকদেরও বুক-কাঁপুনি বন্ধ হয়েছিল।

হ্যানিবলের গুহায় ঢোকার মুখে বহুদিন আগে পড়া গল্পের এই অংশটি মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। সামনে গাইড, পেছনে আমরা। এক-এক করে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সবাই। এ যেন আদিম যুগের গুহা। এক-এক জায়গায় এক এক ধরনের শিলাস্তর। আর, কী তার বর্ণবাহার! সামান্য উঁচু-নিচু পথ প্রাকৃতিক নিয়মে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। অল্প ওয়াটের বিদ্যুতের আলোয় গুহার মধ্যে আশ্চর্য আলো-আঁধারি।

বেশ ঠান্ডা ছিল গুহার মধ্যে। কোথাও কোথাও রীতিমতো স্যাঁতসেঁতে। পাথরের গা বেয়ে জল চুঁইয়ে পড়ার শব্দও শোনা যাচ্ছিল মাঝেমধ্যে। বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড গুহার বিভিন্ন বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। তারপর শোনাচ্ছিলেন প্রাচীন গুহার ইতিহাস। শিলাস্তরের বিন্যাস আলাদা-আলাদা হওয়ার প্রাকৃতিক কারণও জানাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে এই গুহার মধ্যে টম আর বেকির হারিয়ে যাওয়ার বৃত্তান্তও শোনা যাচ্ছিল ওঁর মুখে। আদিম ওই গুহার মধ্যে আমরা সবাই বোধহয় কমবেশি গুহামানুষ হতে শুরু করে দিয়েছিলাম। হঠাৎ একসময় মৃদু বিদ্যুতের আলো একেবারেই নিভে গেল। নিকষ অন্ধকার গুহার মধ্যে আমরা। পাশের মানুষটিকেও দেখা যাচ্ছিল না।

আমি পাওয়ার-কাট দেশের মানুষ। বিদ্যুৎ-বিপর্যয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু এখানে, এই দুর্গম গুহায়, আলো যদি চট করে ফিরে না আসে! এতগুলো মানুষ, কিন্তু কোথাও টুঁ শব্দটিও ছিল না ...।

কয়েক মুহূর্ত বাদে মোমবাতি জ্বালালেন গাইড। তারপর ধরা-ধরা গলায় বললেন : আপনাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে—টম আর বেকিও এই গুহায় মোমবাতি জ্বালিয়েছিল। মোমবাতি জ্বালিয়েছিল ভয়ংকর সেই খুনে ইনজুন জোও। সঙ্গে ছিল ওর এক সাগরেদ। ওদের দেখেই পেছনদিকে ছুট লাগিয়েছিল টম আর বেকি।

মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা মৃদু আলোয় গুহার মধ্যে গল্পকাহিনির ওই অ্যাডভেঞ্চার বেশ একটা গা-ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছিল। গল্প শেষ হল আর আলোও জ্বলে উঠল। পরে জানতে পেরেছিলাম ইচ্ছে করেই বিদ্যুতের আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলেন গাইড। গুহার দেয়ালের এক খাঁজে একটা সুইচ আছে। উদ্দেশ্য একটাই — গল্পের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই আবহ তৈরির ব্যাপারে আমেরিকানরা খুব মাথা খাটিয়ে থাকেন।

॥ ২ ॥

হ্যানিবলের গুহার আলো-আঁধারিতে ঘণ্টাখানেকের সফর সেরে যখন বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম, তখনও টমদের অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনির কিছু অংশ মাথার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল।